নেশা আর পেশার দ্বন্দ্ব

শ্যামল ঘোষ

১ : কেন থিয়েটার

আদিম মানুষ কিসের টানে গুহাচিত্র আঁকতো, লতাপাতার পোশাক পরে, গায়ে মুখে অসংখ্য আঁকিবুকি টেনে নিজেকে বিচিত্র করতো, হাড়ের নলে ফুটো করে নানান ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতো যেমন জানি না, তেমনি শৈশবে কোন চাঁদের টান আমার বুকে অভিনয়ের জোয়ার এনেছিল ঠিকঠাক বলতে পারব না। শুধু মনে আছে বড়দের সামনে অন্যদের অনুকরণ করে বেশ বাহবা পেতাম। পাঠ্য কবিতা বেশ ভাব দিয়ে জোরে-জোরে আবৃত্তি করে আনন্দ পেতাম। কোনোও গান দু-একবার শুনেই মোটামুটি গেয়ে দিতে পারতাম—এমনি সবকিছুর যোগফলই হয়ত অভিনয়ের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। হয়ত নিজেকে অন্যরূপে প্রকাশ করার আনন্দেই আমি থিয়েটার ভালবেসে ছিলাম। এসেছিলাম।

২ : গ্রুপ থিয়েটার

গ্রুপ থিয়েটার প্রসঙ্গে কিছু বলতে যাবার আগে একবার নিজের অতীতটাকে হাতড়ে দেখা দরকার। কিশোর বেলায় থিয়েটার ভাললাগার তাগিদে শ্যামবাজারের পেশাদার মঞ্চে সুযোগ পেলেই নাটক দেখতে আসতাম। অনেক দেখেছি। শিল্পমান বোঝার বয়স বা বুদ্ধি কিছুই ছিল না তখন—কেউ বুঝিয়ে দেবেন এমন লোকেরও সন্ধান পাইনি—তবু চোখ আর কানের তৃপ্তি খুঁজতে ছুটে যেতাম। তখন যা দেখেছি ওই-সব মঞ্চে তাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছি মনে মনে। বিরোধ বাধলো যেদিন পাড়ায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের আমন্ত্রিত অভিনয় দেখলাম প্রথম। মমতাজ আহমেদের নির্দেশনায় দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাস্তুভিটা"। হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেই প্রযোজনা দেখে। এ কেমন থিয়েটার! পেশাদার মঞ্চের মতো কোনও চটক নেই, জেল্লা নেই— এ যেন রাস্তায় হামেশা দেখতে পাওয়া কিছু নারীপুরুষ। কী সহজ তাদের বাচনভঙ্গি, কী অনায়াস তাদের আচরণ—সেই অর্থে হয়ত কোনও বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করা যায় না তবু কী জীবন্ত, কী নিদারুণ বিশ্বাস্য। আমার এতকালের ধারণা যেন তাকে অভিনয় বলেই মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত তবু কী বাস্তবানুগ! কেমন যেন ঘোর লেগে গেল। অনেক ঘুরে-ঘুরে শেষে গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলাম। সময়টা ১৯৪৯ সালের শেষের দিক।

এখানে গিয়েই প্রথম আবিষ্কার করলাম থিয়েটার করতে গেলে সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ প্রাথমিক শর্ত। থিয়েটার করার পিছনে যে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে,

আদর্শবোধ থাকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, পেশাদারি দক্ষতা অর্জন করতে হয়, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, একটু-একটু করে এইসব অজানা তথ্য জানা হতে লাগল। এমনিভাবেই একদিন প্রচলিত থিয়েটারের ছায়া মন থেকে সরে যেতে-যেতে কবে যেন নতুন এক থিয়েটারের মোহে জড়িয়ে পড়লাম।

১৯৫৬ সালে কিছু বন্ধু মিলে 'গন্ধর্ব' নামে একটি দল গড়েছিলাম। সে-ই আমার গ্রুপ থিয়েটারে প্রথম পদক্ষেপ। তখন চোখের সামনে 'বহুরূপী' আর 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' আদর্শ গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে পথিকৃত। ১৯৬৪তে গন্ধর্ব ছেড়ে 'নক্ষত্র'। গন্ধর্ব গড়ার কালে 'গ্রুপ থিয়েটার' নামটির প্রচলন হয়নি। কিন্তু শৌখিন আর পেশাদার থেকে ব্যতিক্রমী এক থিয়েটার। সমাজ সচেতনতা ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এক থিয়েটার। যাদের নাট্য রচনা ও প্রযোজনার মধ্যে আছে মৌলিকতার অন্বেষণ। সমকালীন থেকে ধ্রুপদী বিষয় নিয়েও সৃষ্টিশীল নাট্যপ্রয়াস। স্বদেশ ও বিদেশের নাট্যসাহিত্যের মেলবন্ধন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এক স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি এক ধরনের নবত্ব সৃষ্টি করেছিল সেই থিয়েটারে যা তখন 'নবনাট্য' নামে পরিচিতি পায়।

গণনাট্য সঙ্ঘ শেষের দিকে যত 'অ্যাজিট প্রপ'-র দিকে ঝুঁকলেন, নবনাট্য ততই নিত্যনতুন বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে অনেক বেশি প্রসারিত করল নিজেকে। সোফোক্লেস, শেকসপীয়র, শূদ্রক, রবীন্দ্রনাথ, ম্যাকসিম গর্কি, বিজন ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অনেক নবীন নাট্যকারকে টেনে আনল তাদের আসরে। এই নবনাট্য পথ চলতে-চলতে কখন যে গ্রুপ থিয়েটার হয়ে গেল মনে নেই। এই থিয়েটার তাদের নিজস্ব ভাবনা ও বিষয়বস্তু নিয়ে একদিন পেশাদার মঞ্চও দখল করে ব্যাপ্তি ও পরিচিতি বাড়িয়ে তুললো। দর্শকমহলে যার মধ্যে 'এল.টি.জি' ও পরবর্তীকালে 'নান্দীকার'-এর নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। গ্রুপ থিয়েটারের বৃহত্তর বৃত্তে এসে ধীরে-ধীরে স্বদেশী নাটোর পাশাপাশি বিশ্বনাট্যের দরজাও যেন একটু-একটু করে প্রসারিত হতে লাগল আমার চোখের সামনে। ক্ষণে-ক্ষণে এক বর্ণাঢ্য বিস্ময়ে যেন অভিভূত হতে থাকলাম। শিখলাম শুদ্ধমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়কে চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপনই নয়, তাকে শিল্পমানে উন্নীত করতে হবে, বস্তুনিষ্ঠ, জীবনমুখি ও সর্বোপরি রসোত্তীর্ণ করে তুলতে হবে। জানলাম নাটকে সাহিত্যগুণ থাকা অত্যন্ত জরুরি। বাস্তবমুখিনতার সঙ্গে-সঙ্গে পরাবাস্তবকেও অস্বীকার করা যায় না। মনোবিশ্লেষণের দক্ষতা আয়ত্ব করতে হবে অভিনেতাকে। পুরনোকে বাতিল না করে সেই প্রাচীন সোপান বেয়েই আমাদের যাত্রা করতে হবে নবীনতীর্থের সন্ধানে। তার জন্য বিপুল শ্রম চাই। ত্যাগ স্বীকারের মন চাই। বোধকে উন্নীত করা চাই। মনকে সঠিক পথে চালিত করার অভিনিবেশ চাই। আর তার জন্য চাই কঠোর অনুশীলন। সেই চেষ্টা চলল। কিছু হল কিছু হল না তবু প্রয়াস থামল না।

গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করতে-করতে এমনি কত কিছুই শিখলাম, জানলাম। থিয়েটারের নতুন ভাষা খোঁজবার চেষ্টা চলতে লাগল। কত বৈচিত্র কত দিকে। এক সৃজনশীল জগতে সাধ্যমত সামর্থ নিয়ে কিছু পরিশ্রমী উদ্যমী ছেলেমেয়ে উঠে পড়ে কাজ করতে লাগল।

তাতে ভালমন্দ দুই-ই ছিল—কিন্তু মুখ্য ছিল কাজ করার আগ্রহ। মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতায় এই থিয়েটার নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগল। দর্শকের মধ্যেও তখন নতুন স্বাদ পাওয়ার অভীপ্সা। নিউ এম্পায়ার থেকে শুরু করে ভাঙাচোরা মুক্ত অঙ্গনের মতো মঞ্চেও তখন কত না বর্ণাঢ্য প্রযোজনা। বিরোধ তখন কিছু অনুভব করা যায়নি, করা গেল অনেক পরে। সে কথা পরেই আলোচ্য।

৩ : দল

নাটক ভালভাবে করতে গেলে পরিচ্ছন্ন ও শক্তিশালী দল তো অবশ্যই চাই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাদের দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা শৈশব থেকেই আমাদের শিখিয়ে দেয়, যেপথে অর্থাগম হয় না সে পথ অবশ্য পরিত্যাজ্য। তাই উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এমনকি কেরানি তৈরি করার জন্যও আমাদের অভিভাবকেরা যত পরিশ্রম করেন, ততটাই বা তারচেয়েও বেশি নিরুৎসাহিত করেন তাঁদের সন্তানদের কোনও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে। বিশেষত অভিনয়শিল্প। এ সব যে নিতান্ত বালখিল্যতা শিশুকাল থেকেই আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা তা বুঝে ফেলে বড়দের দৌলতে। তাই থিয়েটার শিল্পের মতো একটা কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য যে শ্রমদান প্রয়োজন তা উপলব্ধিই করতে পারে না, আগ্রহও থাকে না। তবু তারই মধ্যে আলটপকা কিছু বেপরোয়া ছেলেমেয়ে শিল্পকে ভালবেসে থিয়েটারে এসে পড়ে। তাদের সঠিক পথে চালনা করতে পারলে দল শক্তিশালী হয়—ভাল নাটক প্রযোজনার পথ সুগম হয়, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? যিনি পারেন, যাঁরা পারেন তাঁরা ফুল ফোটান। অন্যথায় সেই থোড় বড়ি খাড়া।

৪ : পেশা, পেশা

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পরে আমি মোটামুটি ভাবে 'গন্ধর্ব' আর 'নক্ষত্র'-র সঙ্গে কাজ করেছি। গন্ধর্বে স্কটিশচার্চ কলেজের ছেলেমেয়েরাই ছিল। সকলেরই প্রায় কাঁচা বয়স। তারুণ্যে টগবগ করছে। নতুন কিছু করার আনন্দে, গড়ার আনন্দে উন্মাদের মতো খেটেছে। একটানা ছ-মাস মহলা চলেছিল ঋত্বিক ঘটকের "দলিল" নাটকের। একদিনও ছুটি ছিল না, কেউ একদিনও গরহাজির হয়নি। কম ক্ষমতাকে বিপুল শ্রম দিয়ে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা ছিল। এর আটবছর পরে যখন নক্ষত্র গড়া হল তখন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও মনস্ক তরুণ-তরুণীদের পাওয়া গিয়েছিল। গন্ধর্ব গড়ার সময়ে গণনাট্য সঙ্ঘের সামান্য অভিজ্ঞতা ও প্রভাব নিয়ে শুরু করেছিলাম গ্রুপ থিয়েটারের কাজ। প্রতিমুহূর্তে হাতড়ে-হাতড়ে চলেছি, চলতে-চলতে শিখেছি—নক্ষত্রের বেলায় সেই ক'বছরের জমানো অভিজ্ঞতা পুঁজির মতো ব্যবহার করে কাজে নামলাম। যে আবেগ গন্ধর্বের বেলায় প্রায় অনির্দেশ্য ছিল, নক্ষত্রে তা বেশ

সংহত রূপ নিতে লাগলো। ৫৬ থেকে ৬৪-র মধ্যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বেশ তফাৎ ঘটে গিয়েছিল। ১৯৭৫ পর্যন্ত একটানা নানান রীতি ও বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর প্রায় এক যুগ বিরতি।

১৯৮৮-তে ঘরে ফিরলাম। ফিরে দেখি থিয়েটারের হালচালটাই কেমন বদলে গেছে। ততদিনে ঘরে ঘরে টি.ভি. জাঁকিয়ে বসেছে, সঙ্গে ভি.সি.আর., ভি.সি.পি.। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এসেছে। মানুষ অনেক সমাজসচেতন ও হিসেবি হয়েছে। দ্রুত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষের মূল্যবোধ কমে যাচ্ছে। অনেকের মধ্যেই তখন কেমন একটা 'কেৎনা দিয়া কেৎনা লিয়া' গোছের ভাব। থিয়েটারে বৈচিত্র এসেছে, নিপুণতা এসেছে তার সঙ্গে কোথাও-কোথাও কালচার আর শিল্পের নাম দিয়ে অনেক আকিঞ্চিৎকর বস্তু মনোরঞ্জক মোড়কে মুড়ে বাজার মাত করার প্রবণতাও এসেছে। অনেক নতুনদের মধ্যেই লক্ষ করা গেল শ্রমবিমুখতা, অন্যমনস্কতা এবং দ্রুত প্রাপ্তির অন্বেষা। কত কম সময়ের মধ্যে নিজেকে কত বেশি তুলে ধরা যায় তার যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে। অবশ্যই এর ব্যতিক্রমও আছে। জান লড়িয়ে থিয়েটার করার মানুষ এখনও ঢের আছে কিন্তু কৌশল আর ভঙ্গির বদল ঘটেছে তাঁদের মধ্যেও। ভালবাসায় যার জন্ম, বুকের ভিতরের সেই টান হারিয়ে গেলে শুধুমাত্র সংবিধানের দড়িদড়া দিয়ে তাকে কি আর বেঁধে রাখা যাবে? অল্প আয়াসে বড় প্রাপ্তির আশায় যারা ছুটবে, পেশাদারিত্বের কথা বলে, অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার দোহাই দিয়ে যাঁরা সজ্ঞানে, কৌশলে গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে বাণিজ্যিক থিয়েটারি হাওয়া বইয়ে দেবে সংগঠনের কোন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিরোধ করা যাবে? তা সত্ত্বেও ভাল থিয়েটার হচ্ছে, হবে। গাছের দু-একটা ডাল শুকিয়ে গেলেও পুরো গাছটা যে মরে না সে বিশ্বাস আমার আছে।

৫ : থিয়েটারের সর্বক্ষণের কর্মী

সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে থিয়েটার করতে পারলে তার চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে? সারাদিন থিয়েটার নিয়ে ভাববে, পড়বে, জানবে, অনুশীলন করবে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখবে, চিনবে, পরখ করবে, কল্পনা আর অনুভবের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে তুলবে। জীবনকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য নিজেকে সমৃদ্ধ করবে। কবিতা কি সঙ্গীত, স্থাপত্য কি নৃত্যকলা, রঙ আর আলোর ব্যবহার বোঝবার জন্য গ্রন্থ আর গুণীমানুষের সাহচর্য খুঁজবে—তেমন সুখ আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তাই আমাদের দেশের গ্রুপ থিয়েটারে সর্বক্ষণের কর্মী হবার কল্পনা প্রায় আকাশকুসুম। হবেই বা কি করে? যারা আগে থিয়েটার করত তাদের বেশির ভাগই তো মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে এবং সাংসারিক আয় সীমাবদ্ধ, তাদের মধ্যে কিছু ছাত্র, কিছু বেকার, কিছু সদ্য চাকরি পাওয়া যুবক-যুবতী। দিনযাপন আর প্রাণধারণের হিসেব-নিকেশ করতে করতেই দিন চলে যায় যাদের, (গ্রুপ থিয়েটারের কাজে তো কোনও অর্থাগম হয় না, নেহাতই বনের মোষ তাড়ানো) সে কাজ করার বাড়তি সময় তারা পাবে কোথায়? মোটামুটি বেঁচে থাকার

রসদই বা তাদের জোগাবে কে ?

তবু ধরা যাক কেউ সর্বক্ষণের কর্মী হবার জন্য শক্ত করে কোমর বাঁধল—কিন্তু সারাটা দিন কী কাজ করবে ? পড়াশুনো, লেখালেখি, ব্যক্তিগতচর্চা এই তো ? কিন্তু থিয়েটার যেহেতু যৌথশিল্প—সবারই থাকবে সারাদিন ভিন্ন ভিন্ন পেশায় জড়িয়ে, তাহলে কাদের সঙ্গে কাজ করবে সে ? অন্যদেশে হয়ত বিধি অন্যরকম আছে কিন্তু আমাদের দেশে আমার মনে হয় এ প্রায় অসম্ভবের কল্পনা। তবে অভিনয়কে যিনি পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তিনি হয়ত সারাদিন অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকছেন ঠিকই—কিন্তু পেশা বাঁচাতে গিয়ে কতটা তাঁর নিজস্ব থিয়েটারের প্রতি মনোযোগী হতে পারছেন বলা মুশকিল। তবে এর মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। কেউ-কেউ ভাবে সত্যিই পারছেন, কিন্তু ব্যতিক্রমকে তো আর স্বতঃসিদ্ধ বলে মানা যায় না।

এ প্রসঙ্গে একটা পুরনো গল্প মনে পড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার "চৈতন্যলীলা" দেখতে এসেছিলেন গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারে। ঠাকুরের ইচ্ছে হল তিনি টিকিট কিনেই থিয়েটার দেখবেন। তখন এক ভক্ত আট আনা দিয়ে (তখন ওই দামে পাওয়া যেত) টিকিট কিনতে গেলে রামকৃষ্ণদেব বললেন—ওরে না না, একটা টাকাই দে। গিরিশ যে আমাদের ষোলো আনা দেয়, ওকে কি আট আনা দেওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী ভেবে বলেছিলেন জানি না কিন্তু আমরাও যদি আট আনা বা চার আনা দিয়ে দর্শকদের কাছে ষোলো আনা আশা করি সেটা কি অন্যায় আবদার হবে না ?

৬ : কৃষ্ণযাত্রা

শহর ও শহরতলিতে গ্রুপ থিয়েটার সমাদৃত খুবই কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তেমন হতে পারল না কেন কে জানে ? তবে মফস্বলের দলগুলি তো মাঝে-মাঝে গ্রামে যায়, কিছু জনপ্রিয়তা তো আছে নিশ্চয়ই। নইলে যাবেই বা কেন ? গণনাট্য সঙ্ঘ একদা গ্রামে বেশ ভাল কাজ করেছে—রাজনৈতিক সচেতনতা এনে দিয়েছে। সরলতার অভাবই জনপ্রিয়তা না পাবার অন্যতম কারণ কিনা জানি না। একদা কবিগান, তরজা, কৃষ্ণযাত্রা যে গ্রামের মানুষের নাড়িতে টান দিয়েছিল তার পিছনে হয়ত বিষয় ও বাকভঙ্গির সরলতাই সবিশেষ আকর্ষণ ছিল। ইদানীং অবশ্য অসংখ্য ভিডিও পার্লারের দাপটে গ্রামের মানুষ তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে। জটিলতা বাড়ছে ক্রমশ। গ্রুপ থিয়েটার কিসের সঙ্গে পাল্লা দেবে ?

৭ : দল, ভাঙ্গন ইত্যাদি

দল বদল, নতুন দল গঠন এসব নতুন কিছু নয়—বরাবরই তা হয়ে আসছে। এর পিছনে কোথাও-কোথাও ব্যক্তিস্বার্থ কাজ করলেও মূলত আদর্শগত বিরোধই অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা ছাড়াও দলীয় অব্যবস্থা, অবিচার,

অন্যায় আচরণ, দলের মধ্যে প্রেম ইত্যাদি বহু ছোটখাট নৈতিক কারণও অনেক দলকে ভাঙনের মুখে ঠেলে দেয়। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির না থাকলে যেমন সমুদ্রে নাবিক দিগভ্রান্ত হয়, কূলে পৌঁছানো দুরূহ হয়ে ওঠে তেমনি নাট্যদলের মত ও পথ সুনির্দিষ্ট না হলে এ ধরনের ঝড়-ঝাপটা তাকে সইতে হবেই। আমাদের গোড়ার যুগে দেখেছি একদলের অভিনেতা অন্যদলে অভিনয় করতেন না। ইদানীং অবশ্য একাধিক দলে আমন্ত্রিত হয়ে অনেকে অভিনয় করে থাকেন—সেটা 'মুক্ত চিন্তার' প্রভাব কিনা ঠিক বলতে পারব না। এর ফলে একদিকে থিয়েটার যেমন পুষ্ট হচ্ছে তেমনি দলীয় দায়দায়িত্বের ঝক্কি এড়িয়ে কেউ-কেউ ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় করে তোলার সুযোগও পাচ্ছেন। আবার এমন দলও দু-চারটে দেখা যাচ্ছে যেখানে দলের প্রধান ছাড়া বলতে গেলে আর প্রায় কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীই নেই, অথচ এদল সেদল থেকে সংগ্রহ করে বেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সে সব প্রযোজনাও খেটেখুটে তৈরি করলে মন্দ হয় না। সংগঠন ভাল হলে, তেমন-তেমন প্রচার করতে পারলে জনপ্রিয়ও হয় কিন্তু সদর্থে কোনও বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার কিছু গ্রুপ থিয়েটার একত্রিত হয়েও নির্বাচিত শিল্পী-সমন্বয়ে এক-আধটি নাটক প্রযোজনা করেছেন, বলাবাহুল্য সেগুলি খুবই সমর্থ এবং শিল্পমণ্ডিত। এ ধরনের প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য যদি তাঁরা শেষপর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শে অবিচল থাকেন। আদর্শ দলের ক্ষেত্রে আদর্শের প্রশ্নটি জরুরি। শুধুমাত্র নিজেকে তুলে ধরার জন্য দল গড়লে তাতে হয়ত আত্মতুষ্টি আসতে পারে কিন্তু পূর্ণতা পায় না এবং সামান্য কারণেই ধস নামার সম্ভাবনা থাকে। তবু বলব এটাই কিন্তু সর্বাঙ্গীন চিত্র নয় গ্রুপ থিয়েটারের। আদর্শ ও স্বপ্ন বুকে নিয়ে থিয়েটারের কাজ করে চলেছেন অসংখ্য দল, অজস্র ছেলেমেয়ে তাঁরাই থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আগামীকালের দিকে। ভাল-মন্দর বিচার থাকুক না হয় মহাকালের হাতে।

৮ : জীবিকার টান

যাত্রায় গিয়েছিলাম মূলত জীবিকার প্রয়োজনে। অবশ্য অভিনয়ের অন্য একটি মাধ্যম বুঝে নেবার আগ্রহ যে ছিল না তা জোর করে বলা যাবে না। ওখানে গিয়ে অনেক কিছু দেখেছি, শিখেছি সে সব বারান্তরে আলোচনা করা যাবে। তবে খোলা মঞ্চে বহু দর্শকের সামনে দিনের পর দিন অভিনয় করতে-করতে শুধু আনন্দ নয়, মনোবল ও আত্মবিশ্বাস যে বাড়তে থাকে অভিনেতার, সেটা উপলব্ধি করেছি। যাই হোক ভাল-মন্দ মিলিয়ে আমার সঞ্চয়ের ঝুলি বেশ ভরে উঠেছিল।

৯ : রিপ ভ্যান উইঙ্কল

আবার থিয়েটারে ফিরে এসে নিজেকে 'রিপ ভ্যান্ উইঙ্কল' মনে হচ্ছিল। সব কিছু কেমন যেন অচেনা। পুরনো হালচাল বদলে গেছে। পুরনো আদর্শ, মূল্যবোধ

বাতিল হয়েছে। নতুন যুগের আবহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। পারব কিনা জানি না। তবু চেষ্টা।

১০ : জাত কি ছেলের হাতের মোয়া

গ্রুপ থিয়েটার থাকবে। যদিও ইদানীং বাণিজ্যিক থিয়েটারি ভাবনার হাওয়া লেগেছে তার গায়ে, পেশাদারি জগতের হাতছানি অনেককেই টানছে। টানুক। পেশাদার হলেই যে জাত যাবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং পেশাদার থেকেও কেউ যদি তার শিল্প-ভাবনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে, যে কাজ করবে বলে অন্য থিয়েটার গড়ে তুলেছিল তার প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে পারে তবে তার চেয়ে স্বস্তির আর কি হতে পারে। অন্ততপক্ষে বিশ্বাসভঙ্গের দায় তো তার উপর বর্তাবে না। অবশ্য সম্প্রতি যেভাবে থিয়েটার করার ব্যয় বাড়ছে তাতে এখনই কোনও বিকল্প ভাবনায় গ্রুপ থিয়েটার না এলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। □